মৃ । ত্যু । অ । ভি । জ্ঞ । তা

অন্তর্জলি যাত্রা...

আবদুল্লাহ আল হারুন

৭৭ সালে ধরতে গেলে এক রকম দেশ থেকে পালাতে হলো। চাচা আপন প্রাণ বাঁচার সুপ্রাচীন নীতিটিই দেশছাড়া করে ছাড়ল! মাস তিনেক গ্রিসের এথেন্সে থেকে জার্মানে পাড়ি জমালাম। রাজনৈতিক আশ্রয়ের পাল তুলে জীবন নৌকাটি ভাসিয়ে দিলাম অনিশ্চিতের পথে। আট বছরের টানা-হেঁচড়ার পর, মূলত আমার জার্মান সঙ্গিনীর সক্রিয় সাহায্য-সহযোগিতায় সদাশয় জার্মান সরকার আশ্রয় মঞ্জুর করলেন। তারপর এ চাকরি সে চাকরি (বড় দরের নয়, হোটেলে রাতের চৌকিদারি বা ফার্মের স্টোরকিপারি), কোনোটাই টেকাতে পারি না! দেশে ইংরেজির মাস্টার ছিলাম, সেটা হঠাৎ কাজে লেগে গেল। আবারও সঙ্গিনী আদাজল খেয়ে ১৯৯২ সালে সরকারি খরচে তিন বছরের একটা ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা আমার জন্য করতে সক্ষম হলেন।

ট্রেনিং শেষে সার্টিফিকেট হাতে পেলাম '৯৫-এর মার্চে। মাস চারেক বেকার থাকার পর, জার্মানের উত্তর সীমানায় এক প্রদেশে (প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দূরে) একটি বিদেশী ফার্মে কেরানিগিরি জুটে গেল। আট বছর পর সঙ্গিনীর সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের বীজটা এভাবেই রোপিত হয়েছিল। ১৭ মাস (ডিসেম্বর '৯৬) পরেই চাকরিটি গেল, আমার দোষে নয়, ফার্মটিই উঠে গেল! কথায় আছে না, আমিও ফকির হলাম আর দেশে আকাল শুরু হলো। মাসের পর মাস আসে, পোস্ট অফিসে গিয়ে দরখাস্ত ছাড়ি এবং সপ্তাহান্তে বাসার পোস্ট বক্সে তা নামঞ্জুর ফেরত আসে। এ খেলা চলেছিল পুরো '৯৭ সাল ও পরের বছরের সেপ্টেম্বর নাগাদ। পরবর্তী কাজটি জুটেছিল '৯৮-এর অক্টোবরে। জার্মানে এটাই আমার এযাবৎ দীর্ঘতম বেকারত্ব, ২১ মাস!

জার্মানিতে সব ছোট বড় শহরেই পৌরসভা কর্তৃপক্ষ প্রতি সপ্তাহে একটা বুলেটিন জাতীয় পত্রিকা (ফুলস্ক্যাপ সাইজের) প্রকাশ করে এবং বিনামূল্যে প্রতিটি নাগরিককে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে। এতে থাকে শহর ও আশপাশের নানা অনুষ্ঠানাদির খবরাখবর, পৌর কর্তৃপক্ষের কর্মকান্ডের বিবরণ। ১৯৯৭-এর এপ্রিল মাসে আমাদের শহরের বুলেটিনে একটা বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়লো। স্থানীয় কয়েকজন একটি বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। এ শহরে তারা একটি হজপিস গ্রুপ গঠন করতে চান।

সুইজারল্যান্ড দেশটির শতকরা নব্বই ভাগ পাহাড়-পর্বত। এ দেশটিতে কোনো সমুদ্র নেই। জার্মানি, ইটালি, ফ্রান্স আর আল্পস পর্বতমালা দিয়ে ঘেরা। মধ্য যুগে যেহেতু এখনকার মতো রাস্তাঘাট, ট্রেন লাইন ছিল না, সেখানকার লোকজনদের মূলত গিরিপথ দিয়ে চলাচল করতে হতো। কোনো কোনো গিরিপথ ছিল ৩০-৪০ মাইল দীর্ঘ। ক্লান্ত ক্ষুধার্ত ও অসুস্থ পথিকদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য ঐ সময় প্রধানত গির্জার উদ্যোগে দীর্ঘ গিরিপথগুলোর দুই মাথায় হজপিস নামে যাত্রীদের জন্য বিশ্রামাবাস নির্মাণ করা হয়। আমাদের দেশেও শতবর্ষ আগে যেখানে পথিকরা দীর্ঘ পথে চলতেন, সেখানে দয়াশীল ধনী ব্যক্তিরা পান্থশালা নির্মাণ করতেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এসবের প্রয়োজন অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। সুইজারল্যান্ডেও ১৯ শতকের শুরুতে এসব সেবাসদনগুলো লুপ্ত হয়ে যায়।

ষাটের দশকের শেষে জার্মানিতে পরিবারপিছু সন্তানের সংখ্যা ভয়াবহভাবে কমে আসতে থাকে। এ বছর যে সর্বশেষ হিসাব বেরিয়েছে, তা পরিবারপিছু মাত্র ১.৬ জন! চিকিৎসা ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে মানুষের আয়ু বেড়ে গেছে। ওল্ড হোমের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। ১৮ বছর হলেই ছেলেমেয়েরা বাপ-মার বাঁধন কেটে সিঙ্গল থাকার জন্য ব্যাকুল! বুড়ো বাপ-মার দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে হয় না, সবারই জন্য আর্থিক সুব্যবস্থা আছে। পেনশন না থাকলে (সম্ভাবনা খুবই কম), নিয়মিত আর্থিক সাহায্য (সরকারি/ বেসরকারি) হাতের কাছেই আছে! গগনচুম্বী সচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে অনিবার্যভাবে নির্মম একাকিত্ব! শতকরা নব্বইজন জার্মান হাসপাতালে একাকী মৃত্যুবরণ করেন। অধিকাংশেরই অবসর জীবন কাটে ওল্ড হোমে। ছেলেমেয়েরা যার যার জীবন নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের মতো নয় যে, বৃদ্ধ বয়সে একমাত্র সন্তানের বা অন্যের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া বাঁচার আর কোনো পথই নেই।

শেষ মুহূর্তে প্রিয়জন কেউ পাশে থাকুক, শেষ জানাবার কথাটি যেন কাউকে বলে যেতে পারি, এসব ব্যাকুলতা সর্বজনীন, সর্বকালের সর্বদেশের। ছেলেমেয়ে দূর দেশে, সঙ্গী বা সঙ্গিনী আগেই প্রস্থান করেছেন। হাসপাতালে মৃত্যুর আর কোনো বিকল্প নেই। আবার একাকী ও নিঃসঙ্গ মৃত্যু এড়ানোর জন্য অনেকেই এখন আর হাসপাতালে মরতে চান না। যারা নিজের বাড়িতে মৃত্যুশয্যায়, সঙ্গী বা সঙ্গিনী তাকে দিবারাত্রি সঙ্গ দিতে পারে না, তারও তো ঘুমের বা বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। এ সমস্ত পরিস্থিতির সময়োচিত এবং মানবিক ব্যবস্থা নেবার জন্যই হজপিস আন্দোলনটি ৭০ দশকে ইউরোপে, রুগ্ণ ও মৃত্যুর মুখোমুখি মানুষদের শেষ দিনগুলোতে সঙ্গ দেবার জন্য, ব্যাপক জনপ্রিয়তা নিয়ে শুরু হয়।

এখন জার্মানের প্রতিটি বড় শহরেই হজপিসের নিজস্ব ভবন রয়েছে, যাতে ২০-২৫টি কামরায় স্বল্প খরচে নিঃসঙ্গ মানুষটি তার শেষ কটি দিন হজপিস কর্মীদের দিবারাত্রি আন্তরিক যত্ন ও আদর নিয়ে আনন্দের সঙ্গে শেষ যাত্রাটি আরম্ভ করেন। যারা নিজের বাড়িতে শয্যাশায়ী এবং একদম একাকী নন, তাদেরকেও হজপিস

> পর পর চারটি রাত এক ৯৫ বছরের বৃদ্ধাকে তার মৃত্যু অবধি সঙ্গ দিলাম। বর্ণনাতীত, অপূর্ব ও অদেখা এক মঙ্গলালোকের দ্বার খুলে গেল আমার সামনে! সেই থেকে আজ অবধি প্রায় অর্ধশতাধিক মৃত্যু পথযাত্রিনীদের আমি সঙ্গ দিয়েছি। প্রতিবারই এক নতুন অভূতপূর্ব আলোকের সন্ধান পেয়েছি। একটি সঙ্গ, আরেকটি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রতিটি মৃত্যুই আমার অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরে দিয়েছে

কর্মীরা বাড়িতে গিয়ে (বেশির ভাগ রাতে) আত্মীয়স্বজন যারা তাকে দেখাশোনা করছেন, তাদের রাতে বিশ্রামের অবকাশ দেন। সারা রাত্রি শয্যার পাশে উপস্থিত থেকে রোগীর গতানুগতিক দেখাশোনার সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। বিজ্ঞপ্তিতে একটি তথ্য-সন্ধ্যার কথা ছিল। সেখানে হজপিসের ব্যাপারে প্রাথমিক ধ্যান ধারণা দেয়া হবে। ছয়টি সপ্তাহান্তে (শনি ও রবিবার) কোর্সটি মোট ৯০ ঘন্টায় সমাপ্ত হবে। কোর্সের পূর্ণ কর্মসূচিটিও এ সন্ধ্যায় আলোচিত হবে। আমার সঙ্গিনী বললেন, তোমার তো মৃত্যুর পরের ধাপটি নিয়ে ভীষণ মাথাব্যথা, তোমার দৃঢ় বিশ্বাস, মৃত্যুর সঙ্গেই সব কিছু শেষ হয় না। হজপিস-কর্মীর ট্রেনিংটা নাও, তাহলে মৃত্যুশয্যায় শায়িতদের সঙ্গ দেবার সময় তাদের কাছ থেকে মৃত্যুর পরে কোনো কিছু আছে কিনা, সে ব্যাপারে হয়তো নতুন অনেক কিছু জানতে পারবে। পরিহাসছলে সেদিন যে কথাটি আমার সঙ্গিনী বলেছিল, পরবর্তী নয়-দশ বছরে সেটাই যে আমার জীবনে একটা বিরাট সত্যি হয়ে দাঁড়াবে, তা সেদিন মোটেও বুঝিনি।

তথ্য-সন্ধ্যায় সঙ্গিনীসহ যথাসময়ে পৌঁছে গেলাম। হলঘরে ২৫-৩০ জন বয়স্কা ও বেশ কিছু বৃদ্ধা বসে আছেন। আমি ছাড়া আর কোনো পুরুষকে দেখলাম না! দেখে আশ্চর্য হলাম যে বৃদ্ধাদের অনেকেরই বয়স ৮০ থেকে ৯০-এর কাছাকাছি! আমার ডান পাশে বসা প্রবীণাটি আমাদের স্থান গ্রহণ করার পর, সাগ্রহে তার হাতটি বাড়িয়ে আমাদের সঙ্গে করমর্দন করলেন এবং বললেন, আমার নাম জুলিয়ানা ক্রুগ। আমরা আমাদের নাম বললাম। সেই প্রথম আমার জুলির সঙ্গে পরিচয় হলো। সে চিরকুমারী, বয়স এখন ৭৩। পেশা ছিল শিক্ষকতা, দশ বছর আগে রিটায়ার করেছেন। থাকেন পাশের শহরে, ১২ কিলোমিটার দূরে, তুবিংগেনে। সে ছিল ইংরেজির শিক্ষক এবং যেহেতু দেশে আমিও ইংরেজির মাস্টার ছিলাম, আমাদের সম্পর্কটা দ্রুতই নিবিড় হয়ে গেল। ছয় সপ্তাহান্তের হজপিস কোর্সের ফাঁকে ফাঁকে আমরা পরস্পরের জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে আলাপ করতাম। আমাদের বাসায় ওকে নিমন্ত্রণ করলাম, ও করল আমাদের ওর তুবিংগেনের বাসায়। ধীরে ধীরে আমরা পারিবারিক বন্ধু হয়ে গেলাম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ওর বাবা নিখোঁজ হন, আজ পর্যন্ত ও জানে না, বাবা যুদ্ধক্ষেত্রে না যুদ্ধ শেষে বন্দী হয়ে মারা যান! ও ছিল বাবা-মার একমাত্র সন্তান। যুদ্ধ শেষে বিধ্বস্ত জার্মানে ওর মা এখানে ওখানে ছোটখাটো কাজ করে দুজনের থাকা-খাওয়ার জন্য সামান্য অর্থ বহু কষ্টে রোজগার করতেন। ঐ সময়কার কথা বলতে বলতে জুলির চোখ দুটো বিষণ্ন হয়ে যেত, অশ্রুর কণা এসে জমতো। ১৯৫০ এ মা জীবন যুদ্ধে দিবারাত্রি অমানুষিক পরিশ্রমের শিকার হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে মারা যান। জুলির বয়স তখন ২৬ এবং তার দুবছর আগেও বাচ্চাদের একটা কিন্ডারগার্টেনে শিক্ষকতার কাজ নেয়। তুবিংগেন শহরই ওর পিতৃভূমি, এখানেই ৫৫ সাল থেকে ও একটা হাইস্কুল (এখানে বলা হয় রিয়াল স্কুল) ইংরেজির শিক্ষক হয়ে আজ থেকে আট বছর আগে রিটায়ার করে। ও কোথায়, কবে, কীভাবে ইংরেজি শিখেছে, সে প্রসঙ্গে আমরা কখনও কথা বলিনি। এ কাহিনীর শেষে আমার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকও জানতে পারবেন এ প্রশ্নগুলোর উত্তর।

যার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে, তাকে সঙ্গ দেয়া যেকোনো স্বাভাবিক ব্যাপার নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রচন্ড (প্রায় অসম্ভব) একটা ধৈর্যের প্রয়োজন। অত্যাবশ্যকীয় সেবাশুশ্রূষার থিয়োরি ও ব্যবহারিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসাও (সংকটাবস্থার জন্য), শেখানো হয়।

ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের নাম সংক্ষিপ্ত করে নিলাম। আমাকে এখানে পরিচিত, একান্তজনেরা সবাই আবদুল্লাহ বলে ডাকতো। জুলিয়ানা আমাকে আবু বলে সম্বোধন করতো, আমি ওকে জুলি। কোর্স শেষ হবার পর, জুলি আমার আগেই একজন অশীতিপর বৃদ্ধাকে তার শেষ যাত্রায় সঙ্গ দিল। তার অভিজ্ঞতার বিশদ বিবরণ শুনে আমার ভীষণ কৌতূহল হলো এবং মৃত্যুপথযাত্রীর সঙ্গ দেবার তীব্র বাসনা অনুভব করলাম। জুলির অত্যন্ত আন্তরিকভাবে দেয়া শেষ যাত্রার অনাস্বাদিত ও আকর্ষণীয় কাহিনী শুনে এবং তার উৎসাহ, মৃত্যুর মুখোমুখি হবার যেটুকু ভয় আমার ছিল, তাও নিঃশেষ হয়ে গেল।

জুলাই মাসে আমার প্রথম অভিজ্ঞতা হলো। পর পর চারটি রাত এক ৯৫ বছরের বৃদ্ধাকে তার মৃত্যু অবধি সঙ্গ দিলাম। বর্ণনাতীত, অপূর্ব ও অদেখা এক মঙ্গলালোকের দ্বার খুলে গেল আমার সামনে! সেই থেকে আজ অবধি প্রায় অর্ধশতাধিক মৃত্যু পথযাত্রিনীদের আমি সঙ্গ দিয়েছি। প্রতিবারই এক নতুন অভূতপূর্ব আলোকের সন্ধান পেয়েছি। একটি সঙ্গ, আরেকটি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রতিটি মৃত্যুই আমার অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরে দিয়েছে। আমি কৃতজ্ঞ সেইসব বৃদ্ধাদের কাছে, মৃত্যুর আগে যারা আমাকে বিশ্বাস করে, আমার কাছে তাদের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, আমাকে একান্ত আপনজন মনে করে বর্ণনা করেছেন এবং হৃদয়ের অন্তঃস্থল ও গভীরতম প্রদেশ থেকে তাদের শেষ কথা আমাকে বলে, না বলার বেদনা থেকে মুক্ত হয়ে শেষ যাত্রার পথে হাসিমুখে চলে গেছেন। একটা মজার ব্যাপার হলো, মহিলারা যেমন শেষ যাত্রায় শুধু পুরুষ সঙ্গী চান, পুরুষরাও তেমনি মহিলা সঙ্গীর ফরমায়েশ করেন। আমি আজ অবধি অনেকবার ইচ্ছে করেও একজন পুরুষের শেষ যাত্রার সঙ্গী হতে পারিনি!

গত ১৬, ১৭ ও ১৮ মে তিনটি রাতে আমি জুলির শেষ যাত্রায় তার সঙ্গী ছিলাম। এ রাতগুলোর বর্ণনা দেবার আগে কিছু পূর্বকথা বলার আবশ্যকতা আছে। ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসে আমাকে জার্মান ত্যাগ করে সুইটজারল্যান্ড চলে যেতে হলো। দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে যে সঙ্গিনীর সঙ্গে একত্র বাস ছিল, একসঙ্গে বৃদ্ধ হবার সাধ ছিল, হঠাৎ করে তা তাসের ঘরের মতো ধসে গেল! অপ্রত্যাশিত এই বিচ্ছেদের ধাক্কা সামলানোর জন্য দ্বিতীয়বারের জন্য দেশত্যাগী হলাম। জীবন সায়াহ্নে একাকিত্বের এ বজ্রাঘাতে এতোই মুহ্যমান হয়ে গেলাম যে, কাউকে না বলেই (এমনকি জুলিকেও না) পিছু নেয়া প্রেমিকার হিংস্র নির্দয়তার থাবার হাত থেকে বাঁচার তাগিদে প্রাণপণে দৌড়ে জার্মানের সীমান্তের অপর পারে পাড়ি জমালাম। সুইজারল্যান্ডে এসে চাকরি, বাড়ি যোগার করে জুলির সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। যে তিন বছর এখানে ছিলাম, জুলি আমার কাছে দুবার বেড়াতে এসেছে। '৭৭-এ জার্মানে আসার পর ২৫ বছরে আমার স্থানীয়, অস্থানীয় শতাধিক স্বজন হয়েছিল। প্রেমিকার অন্তর্ধান যেন হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার মতো তাদেরও আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিল। আমার সেই তিন বছরের দুঃসহ দ্বিতীয় প্রবাস জীবনে, জার্মান থেকে শুধু জুলিই আমাকে সান্ত্বনা দিতে দুবার আমার কাছে এসেছিল। দ্বিতীয় সাক্ষাতের সময় আমরা পরস্পরের সঙ্গে একটি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হই। আমাদের দুজনের মধ্যে যে প্রথম শেষ যাত্রায় রওনা হবে, আরেকজন তাকে সঙ্গ দেবে।

২০০৪-এর নবেম্বরে জুলি তুবিংগেনের বাড়ি বিক্রি করে বার্লিন চলে যায়, ওখানে একটা যৌথ বাড়িতে তার পূর্বপরিচিত দুজন বান্ধবীর সঙ্গে একত্রে বসবাসের জন্য। ওরা দুজনেই চাকরিসূত্রে তার সহকর্মী ছিল, ২ থেকে ১ বছরের ব্যবধানে তারাও রিটায়ার করেন। জুলির মতো তারাও আজন্ম কুমারী, একা, আত্মীয়স্বজনহীনা।

আমিও আবার ২০০৫-এর এপ্রিলে জার্মানে আমার পুরনো শহরে ফিরে আসি। এখানকার বাসাটি আমি ছাড়িনি। অগাস্ট থেকে অক্টোবর, আমি পুনরায় এ শহর ত্যাগ করে, মিউনিকের কাছে একটা শহরে মাস তিনেক চাকরি করি। এ সময়টাতে আমার জুলির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়! আমার নিজেরও দোষ-ত্রুটির অন্ত নেই। তার মধ্যে একটি হলো, হঠাৎ বলা নাই কওয়া নাই, একান্ত স্বজনদের সঙ্গে বহুদিন নিয়মিত যোগাযোগ আর করি না! এ জন্য এ জীবনে বহু সুন্দর সম্পর্ক চিরতরে নষ্ট হয়ে গেছে। নিজের ওপর এজন্য প্রচন্ড রাগ হয় মাঝে মাঝে। সুইজারল্যান্ডে জুলির সঙ্গে বেশির ভাগ যোগাযোগ হতো ই-মেইলে। জার্মানে ফিরে এসে, নতুন চাকরিতে যাওয়ার আগে, টেলিফোন, মেলে ওর সঙ্গে ক্ষীণ একটা যোগসূত্র ছিল। তারপরই পুরনো ভূতটা চাপল কাঁধে। অতীত ফেলে বর্তমানকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। তিন মাসেই চাকরিটা হারিয়ে আবার ব্যাক টু দ্য প্যাভিলিয়ন হয়ে আমার শহরে ফিরে এলাম এবং জুলি 'চোখের বাইরে, বিস্মৃতির অতলে' হয়ে গেল! এ সময়েই ফ্রাংকফুর্টে বাসা বদলের একটা প্রচন্ড বাসনার উদ্ভব হলো। ঐ শহরে জার্মানে সবচাইতে বেশি বাঙালির বসবাস। ভাবলাম এ শহরে তো শুধু প্রাচীন প্রেমের দুঃসহ স্মৃতি! একাকিত্বের অন্তহীন যন্ত্রণা! ফ্রাংকফুর্টে বহু বাঙালি, নতুন করে আবার হয়তো একটা স্বজন-পরিবেশ গড়া সম্ভব হবে। 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনো খানে', কবিগুরুর এ বাণী আমাকে নিশিতে পাওয়া পথহারা পথিকের মতো ব্যাকুল করে তুলল। নতুন বছরে (২০০৬) মার্চ মাস থেকে ফ্রাংকফুর্টে যাতায়াত শুরু হলো। বেশ কয়েকজন নতুন, বন্ধুবৎসল তরুণ বাঙালির সঙ্গে হৃদতা হলো। ওখানে একটা বাসোপযোগী বাড়ি খোঁজার নেশায় মজে গেলাম। মাসে

দু'তিনবার করে ফ্রাংকফুর্টে যাই-আসি। এর মধ্যে জুলি যে আবার তুবিংগেনে ফিরে এসেছে, তাও জানতাম না!

এমনি এক সফর শেষে, ১৫ মে ফ্রাংকফুর্ট থেকে বাসায় ফিরে, টেলিফোনের উত্তর-যন্ত্রে, অনুপস্থিতিতে আসা অনেকগুলো টেলিফোনের মধ্যে একটি অপরিচিত মহিলা কণ্ঠ ভেসে এলো, হ্যালো, মিঃ আল-হারুন, আমার বারবারা স্নাইডার, আমি তুবিংগেনের সেন্ট মার্টিন হজপিস ভবনের পরিচালিকা। আপনি নিশ্চয়ই মিস জুলিয়ানা ক্রুগকে চেনেন। উনি গত মাসে আমাদের এখানে এসেছেন। শুনেছি আপনি নিজেও একজন হজপিস কর্মী। এখানে উনি কেন থাকছেন, তা তো আপনাকে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। আসার পর থেকেই আপনাকে খুঁজছেন।

দুর্ভাগ্যবশত বার্লিন থেকে আসার সময় ওনার নোটবুকটা হারিয়ে যায়, যেখানে আপনার টেলিফোন নাম্বারটা ছিল! বেশিদিন আর তার হাতে নেই, উনার একান্ত ইচ্ছা, আপনার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ! কথায় কথায় বলেছেন, আপনাদের মধ্যে নাকি এ ধরনের একটা প্রতিজ্ঞাও আছে। আমার এ টেলিফোনটি পেলে, অনুগ্রহ করে সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে যথা শিগগির সম্ভব এখানে চলে আসার চেষ্টা নেবেন। সময় বেশি নেই। ধন্যবাদ।

দুঃখে আর তীব্র বেদনায় নিজের ওপর একটা বিরাট ক্রোধের সঞ্চার হলো। আবার সেই একই ভুল! গত দীর্ঘ নয় মাসে জুলির সঙ্গে একবারও টেলিফোনে বা মেলে যোগাযোগের কোনো চেষ্টাই করিনি, যথারীতি একদম ভুলে বসে আছি। আমার মতো অকৃতজ্ঞ আর হৃদয়হীন পাষাণকেই তো কেউ আজীবন ভালোবাসে না! যার প্রমাণ আমার নিজেরই জীবন, হাড়ে হাড়ে একাকিত্বের যন্ত্রণায় অভিশপ্ত হয়ে প্রতি মুহূর্তে দগ্ধ হচ্ছি। নতুন চাকরি আর ফ্রাংকফুর্টে বাড়ি বদলের নেশায় মত্ত হয়ে আর সব কিছু ভুলে বসেছিলাম।

টেলিফোনে মিস বারবারার (হজপিসের সঙ্গে যারা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, যেমন ভবন পরিচালিকা, তারা সবাই প্রায় ক্যাথোলিক-খ্রিষ্টান সন্ন্যাসিনী, অকৃতদার) সঙ্গে যোগাযোগ করে এক ঘণ্টার মধ্যে পিঠ-ব্যাগে সামান্য কাপড়-চোপড় ভরে পরবর্তী বাসেই তুবিংগেন রওনা হলাম।

আধঘণ্টায় হজপিস ভবনে পৌঁছে যখন জুলির কামরায় ঢুকলাম, তখন সেখানে বসন্ত শেষের বিকেলে ঘরের জানালা দিয়ে হলুদ সূর্যের ম্লান আলোর লুকোচুরি খেলা চলছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদ্যুতের আলো জ্বেলে দিতে হবে। ঘরে একটি মাত্র বিছানায় জুলি উঁচু বালিশে মাথা দিয়ে আধশোয়া হয়ে আছে। ও বরাবরই স্লিম, শরীরে একফোঁটা মেদ ছিল না কোনোদিন। অসম্ভব প্রাণবন্ত ও ক্রীড়াশীল জীবন যাপনের জন্য ওকে সবসময় আসল বয়সের চাইতে ১০-১৫ বছর কম দেখাতো। হজপিস কোর্সের সময় (৭৩ বছর বয়সে) সবসময় সে সাইকেল চালিয়ে আসতো যেত। দীর্ঘ একহারা শরীর, কাঁচা সোনার মতো গায়ের রঙ, টানা টানা সুন্দর চোখ। হঠাৎ আজব মনে হলো, এই অপূর্ব সুন্দরী মহিলা কেন যৌবনে কোনো পুরুষের নজরে পড়েনি? জুলির যৌবনকালের যুবকদের দুর্ভাগ্য ও বোকামির কথা ভেবে আজ নিজেরই দুঃখ হলো। কেন ঐ যুগে জুলির শহরে আমার জন্ম হলো না!

চোখ দুটো আগের মতোই মমতাভরা, কৌতূহলি, শুধু উজ্জ্বলতা একটু কমে এসেছে। আমাকে দেখেই উচ্ছল খুশিতে কলকলিয়ে হেসে উঠল, দু'হাতে আমার দু'হাত টেনে নিয়ে বলল, বারবারা দেখি তোমাকে ঠিক খুঁজে বের করেছে! আমি খুবই দুঃখিত, নোটবুকটা হারিয়ে ফেললাম। তুমি তো জানই আমার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল, কোনোদিনই টেলিফোন নাম্বার মনে রাখতে পারি না। যেন নয় মাসের যোগাযোগ না থাকার জন্য ওর ঐ নোটবুকটা হারানোই দায়ী। আমার কাছেও যে তার নম্বরটা আছে, আমিও যে যোগাযোগ করতে পারতাম, সেটা হয়তো তার মনেই নেই! এই হলো জুলি, কোনোদিন অন্যের মধ্যে দোষ দেখে না, সমস্ত ভুলভ্রান্তির দায়িত্ব সব সময় নিজের কাঁধে হাসিমুখে নিয়ে নেয়।

সংক্ষিপ্ত কুশলালাপের পর ও বলল, ফ্রাংকফুর্ট থেকে তো প্রায় সরাসরি এখানেই এলে, এখন তোমার ঘরে যাও, হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেস হয়ে একটু বিশ্রাম নাও। ২-৩ ঘণ্টা ঘুমিয়ে নাও। বারবারার সঙ্গে আলাপ করে আমি ব্যবস্থা করেছি, আজ রাত থেকে আমার ঘরে তোমার ডিউটি। বেচারি মেলানি (এ যাবৎ তাকে রাতে পাহারা দিয়েছে) রাত জাগা থেকে রেহাই পাবে। মাত্র ২৩ বছরের কচি মেয়ে, প্রায় রাতেই ও নিজেই ঘুমিয়ে পড়তো, আমাকেই ওকে জেগে পাহারা দিতে হতো। বলেই সেই প্রাণখোলা কলকলানো হাসি। মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে খুব কম লোকই এমন প্রাণখোলা হাসি হাসতে পারে। জুলির প্রতি আমার শ্রদ্ধা, প্রীতি আর ভালোবাসা আজ আবার নতুন করে ঝলসে উঠল। আমার গর্ব হলো এ ভেবে যে, এ রকম একজন সাহসী ও মুক্ত মহিলার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে।

সব হজপিস ভবনেই ২-৩টি ঘর অতিথিদের জন্য আলাদা রাখা হয়, যারা আত্মীয়স্বজনদের দেখতে আসেন তারা রাত্রিবাস করেন। এ রকমই একটা ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা হলো। ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে ডাইনিং রুমে খেতে গিয়ে দেখি সবাই খাচ্ছেন, জুলি সামনে থালা আর কাঁটাচামচ নিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। পাশের চেয়ারটা খালি। আমার মনে হলো ও নিজেই উদ্যোগ নিয়ে ওটা খালি রেখেছে। আমাকে দেখেই শিশুর মতো খুশি হয়ে তার কাচ ভাঙার হাসিটি হেসে উপস্থিত সবাইকে সচকিত করে আমার হাত ধরে ওর পাশে বসিয়ে দিল। বলল, আমি জানতাম তুমি এখনি আসবে, তাই অপেক্ষা করছি। খাওয়া-দাওয়ার পর কিছুক্ষণ সবার সঙ্গে একটু গল্প-গুজব করে আমরা জুলির ঘরে চলে এলাম। খাওয়ার টেবিলে মিস বারবারা আমাকে ধন্যবাদ জানালেন। বললেন, আমি অত্যন্ত খুশি, জুলিয়ানার সঙ্গে আপনার দেখা হলো। মেলানিরও কষ্ট করে আর রাত জাগতে হবে না। জুলির দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি নিশ্চিন্ত, তুমি এখন তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে রাতে প্রাণখুলে গল্প-গুজব করতে পারবে শেষ কটাদিন। যাদের এসব কথা শোনার অভিজ্ঞতা নেই, তারা খুবই আশ্চর্য হবেন এ ভেবে যে, জুলির মৃত্যু সন্নিকটে, এ কথাটি উনি এতো সহজে কীভাবে বলতে পারলেন! হজপিসের মূল উদ্দেশ্যই এটা। যাদের বয়সের চাপে বা নিরারোগ্য অসুস্থতায় মৃত্যু অনিবার্য (যেমন ক্যান্সারের শেষ অবস্থা বা এইডস) কিন্তু এখনও চলাফেরা করতে পারেন, তাদের মৃত্যুর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করা। এজন্যই হজপিস ভবন। ডাক্তার যাকে জওয়াব দিয়েছেন বা যে মৃত্যুশয্যায় শায়িত কিন্তু কোনো প্রিয়জন কাছে নেই, আত্মীয়স্বজনহীন, তাদের মৃত্যুশয্যায় হজপিস কর্মী শেষ কটি দিনরাত্রি স্বজনের ভূমিকা নিয়ে এ শেষযাত্রায় তাকে সাহস যোগান, তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন, তার শেষ ইচ্ছা পূরণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এ যাত্রায় সেই তার শেষ বন্ধু এ পৃথিবীর সঙ্গে তার শেষ বন্ধন। হজপিস ভবনে মৃত্যু কোনো ভয়ের ব্যাপার নয়। কেউ এ বিষয়কে এড়িয়ে চলেন না, বরং সহাস্যে তা নিয়ে আলোচনা করেন, রস রসিকতা করেন। একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। রাতের খাওয়া সেরে বা মিলনায়তনে (যেখানে টিভি, পত্র পত্রিকা, তাস ও অন্যান্য আন্ত-কক্ষ খেলার সরঞ্জামাদি আছে), শুতে যাবার আগে তারা অত্যন্ত সহজভাবে এ কথা বলে বিদায় নেন, চলি, কাল হয়ত আর দেখা হবে না, আরেক দুনিয়ায় চলে যাবো, খারাপ কিছু বলে থাকলে, মনে রেখো না, মাফ করে দিও, ভালো ঘুমাও, সুন্দর স্বপ্ন দেখো, শুভ রাত্রি। হজপিস আন্দোলনের এটাই প্রধান গৌরব, মৃত্যুকে তারা জীবনের একটা সহজ ও স্বাভাবিক অঙ্গ বলে প্রচার করে, ইউরোপীয় জনসাধারণের একটা ভালো অংশের মধ্যে মৃত্যুভয় দূর করতে সক্ষম হয়েছে। সত্যি বলতে কি, আগে আমারও মৃত্যুর প্রতি একটা ভীষণ ভয় ছিল। 'মরিতে চাহি না এ সুন্দর ভুবনে' ছিলো আমার আন্তরিক কামনা। হজপিজের সক্রিয় কর্মী হয়ে মৃত্যুপথ যাত্রীদের সঙ্গ দিয়ে আমার মরতে আর কোনো ভয় নেই। 'মরণ রে তুহু মম শ্যাম সমান' বলে নয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মৃত্যুর পর কিছুই শেষ হয় না, এটা একটা নতুন আরম্ভ, নতুন আরেক পৃথিবীতে। আমি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করি : 'সম্মুখে শান্তি পারাবার'। আমি আমার এই আন্তরিক বিশ্বাস নিয়ে প্রতিদিন আমার আসন্ন মৃত্যুকে আবাহন করি।

প্রথম রাতে জুলির সাথে আমার আলাপের মূল বিষয়বস্তু ছিলো গত নয় মাসে (যোগাযোগহীন সময়টা) আমরা কে কি করেছি। তথ্য বিনিময়। আমার ফ্রাঙ্কফুর্টে বাসাবদলের ব্যাপারটা সে খুব একটা সমর্থন করলো না। বললো, যতো যাই হোক, এই এলাকাতেই তুমি ৩০ বছর ধরে আছো। মাঝের সুইজারল্যান্ডের তিন বছরেও তুমি এখানকার শহরের বাসাটি ছাড়োনি, এখনও সেখানেই থাকছো। এখানেই তুমি মার্গারেটের সাথে তোমার গত ৩০ বছরের প্রবাস জীবনের সব চাইতে সুখের ও আনন্দের ১৮টি বছর কাটিয়েছ। এটাই তোমার দ্বিতীয় জন্মভূমি। দেখো আমি তো বার্লিনেও মরতে পারতাম। ওখানে বান্ধবী মার্থা ও সারাহ এখনও আছে। ওদের সাথে প্রায় দেড় বছর মহাআনন্দে

ছিলাম। আরও ২/৩ জনের সাথে আমার সেখানে সখ্য হয়েছে। কিন্তু আমি তুবিংগেনে জীবনের শেষ দিন কটা কাটাতে ও পৃথিবী থেকে শেষ যাত্রাটি এখান থেকেই শুরু করার জন্য বার্লিন থেকে চলে এলাম। এই শহরে আমার জন্ম, আমার বাবা-মা এ শহরে জন্মেছেন এবং মাও এখানে মারা গেছেন, এখানেই আমার শিক্ষক জীবনের শুরু ও শেষ। বোধহয় ওর নিখোঁজ বাবার কথা ভেবে একটু থামলো। তারপর বললো, এ শহরে থেকেই আমি তোমার শহরে হজপিস কোর্স করেছি এবং তোমার মতো ভালো বন্ধু পাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমি জানতাম, বার্লিনে এ সময়ে আমি যদি থাকতাম, তোমার সাথে আর দেখা হতো না। তোমার সাথে এ পৃথিবীতে শেষ সাক্ষাতের জন্যই তো, হে প্রিয় বন্ধু আমার, আমি তুবিংগেনে ফিরে এসেছি। আমি না এলে তুমি তো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের লজ্জা ও দুঃখে সারাজীবন কষ্ট পেতে। তোমার ও মার্গারেটের কতো যৌথ স্মৃতি, এক সাথে ঘর করার এবং আরও কতোকিছু এখানের আকাশে বাতাসে মিশে আছে। এখানের বাতাসে এখনও মিশে আছে মার্গারেটের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, যার ছোঁয়া তুমি প্রতিনিয়ত অনুভব করতে পারো। ফ্রাঙ্কফুর্টে এসব কিছুই নেই। আমার তো মনে হয়, ওখানে তুমি মার্গারেটকে আরও বেশি মিস করবে। তোমার বেদনা বাড়বে, তুমি আরও ডিপ্রেসট হয়ে পড়বে। না বন্ধু না, তুমি এখানেই থাকো, অন্য কোথায় যেও না। তোমার কি মনে নেই, সুইজারল্যান্ডেও তো থাকলে না, ফিরে তো আসতেই হালো! আমি জানি, ফ্রাঙ্কফুর্টেও তোমার ভালো লাগবে না, আবার ফিরে আসতে হবে এখানে। আমার তো মনে হয়, তুমি ফ্রাঙ্কফুর্ট যেতেই পারবে না, আমি এখানে তোমাকে টেনে ধরে রাখব। ভেবো না, খুব দূরে চলে যাব, আশেপাশেই থাকব, বলে আবার তার ঝরনার কলকলানো হাসি। সে যে কতো বড় সত্যি কথা সেদিন বলেছিলো, পরে তা টের পেয়েছি। ফ্রাঙ্কফুর্টে যাওয়া সত্যিই আর হয়নি। রাত দুটো অবধি কথাবার্তা বলার পর জুলি বললো, এখন ঘুমুব। ভয় পেয়ো না, সে ঘুম নয়। আজ বা কাল রাতেও রওনা হব না। পরশুর কথা বলতে পারছি না। তোমাকে আরও কিছু কথা বলার আছে। নাও এখন চেয়ারটা লম্বা করে শুয়ে পড়। হজপিস ভবনের কক্ষগুলোতে বিশেষ চেয়ারের ব্যবস্থা আছে, যা লম্বা করে আধশোয়া হয়ে চোখ মোদা যায়, তবে কর্মী তখনই নিজের ঘুমের কথা ভাবেন, যখন রোগী ঘুমিয়ে পড়েন। ঘর ছেড়ে যায় না সে, কখন রোগী আবার জাগেন। আরেকজন কর্মী (বা নার্স) এসে তাকে রিলিভ না করা অবধি, তাকে সব সময় রোগীর কক্ষেই থাকতে হবে।

জুলি অল্প সময়ের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো, ওর মৃদু নাক ডাকার শব্দ শুনলাম, ঘুম গভীর। আমি আধ ঘুম আর আধ জাগা হয়ে অনেকদিন পর আবার মার্গারেটের স্মৃতিচারণ করলাম। জুলি প্রথম রাতেই ওর কথা কেন এতো বললো? রাতে স্বপ্নে মার্গারেটকেও বলতে শুনলাম, না তুমি আমাদের শহর ছেড়ে যেও না। আমি বলতে চাইলাম, কিন্তু তুমি তো আমাদের শহর, আমাকে ছেড়ে অজ্ঞাত স্থানে চলে গেছ, আমার আর এখানে থাকা না থাকায় পার্থক্য কি? সবটা বলতে পারলাম না, ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়িতে রাত ৩টা। মাত্র এক ঘণ্টা কেটেছে। জুলি গভীর ঘুমে অচেতন। মনে হলো, আমার সাথে দেখা হওয়াতে, ও কেন জানি বেশ নিশ্চিন্ত হয়েছে এবং তাই অত্যন্ত তৃপ্তির সাথে ঘুমুচ্ছে। ও কি বলবে আমাকে? একটা ম্যাগাজিন নিয়ে বাকি রাতটা জেগেই কাটিয়ে দিলাম, ঘুম আর এলো না।

দুপুরে খাবার সময় জুলিকে দেখলাম না। বারবারা বললেন, জুলি ওর খাবার আজ ঘরে খেয়েছে। আমি আমার ঘরে আসার সময় ওর ঘরের দরজা সামান্য খুলে ভেতরে তাকানোর চেষ্টা করতেই, একজন নার্স বেরিয়ে এলেন। বললেন, উনি ঘুমুচ্ছেন এবং বিশেষভাবে নির্দেশ রেখেছেন, তাকে যেন, নিজে থেকে ঘুম না ভাঙলে, কোনো অবস্থাতেই ডাকা না হয়। আমার মনে হলো, জুলি আজ সারারাত জাগবে, আমার সাথে কথা বলবে এবং দিনে লম্বা ঘুম দিয়ে তারই প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমিও ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

রাতের খাওয়ার সময় জুলির সাথে দেখা হলো। সহাস্যে জিজ্ঞেস করলো, দিনে ভালো ঘুম হয়েছে তো? আজ কিন্তু তোমার ফুল ডিউটি, আজ রাতে ভোর অবধি কথা বলবো আমরা। আমার আন্দাজই ঠিক হলো। রাত দশটার দিকে মিলনায়তন থেকে সবাইকে বিদায় জানিয়ে জুলির ঘরে এসে আমাদের কথোপথন হলো।

আবার কথা শুরু হলো মার্গারেটকে নিয়ে। জুলি বললো, আমি আজও বুঝি না, ও কেন তোমার জীবন থেকে এভাবে অদৃশ্য হয়ে গেলো? আমার তো মনে হয়, যে সুখ পাওয়ার জন্য সে তোমাকে ছেড়ে গেলো, সে সুখ আজও সে পায়নি। ওর প্রতি তোমার গভীর ভালোবাসার আমিও একজন সাক্ষী। '৯৭ সাল থেকে তোমাদের বিচ্ছেদের বছর ২০০২ পর্যন্ত আমি তোমাদের দুজনেরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। তোমাকে ওর নতুন শহরের ঠিকানা না জানানোর কারণটা আমি বুঝি, তোমার উপর ওর প্রচণ্ড ক্রোধের সাথে ছিলো তীব্র অভিমান। কিন্তু আমাকে ও জানালো না কেন? তোমাকে তো বলেছি, ও তোমাদের শহর ছাড়ার আগে আমাকে টেলিফোন করে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলো। কিন্তু নতুন শহরের নাম বা বাড়ির ঠিকানা আমাকে বলেনি, আমিও গায়ে পড়ে জিজ্ঞেস করিনি। আমি কেন জানি ওর কথাতেই টের পাচ্ছিলাম, ও আমাকে ইচ্ছে করেই বলছে না। ও হয়তো ভেবেছে, আমার সাথে তোমার এতো হৃদ্যতা, আমি হয়তো তোমাকে বলে দেব! তুমি তখন সুইজারল্যান্ডে। কিন্তু আমাকে নিষেধ করলে তো আমি তোমাকে বলতাম না। আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সত্যিই নাকি? তোমাকে মার্গারেট যদি ওর ঠিকানা জানাতো এবং আমাকে বলতে নিষেধ করতো, তুমি আমাকে বলতে না?

না, কখনোই না। আমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করি না।

এ অভিজ্ঞতা আমার এর আগেও কয়েকবার হয়েছে। সে সময়কার বেশ কিছু কমন বন্ধু আমাকে আজ অবধি ওর ঠিকানা জানায়নি। জার্মানির দৈনন্দিন জীবনে ব্যক্তিগত সাধুতা আজও কিংবদন্তির পর্যায়ে। আমি বললাম, কেন তুমি মনে করছো, মার্গারেট যে সুখের সন্ধানে আমাকে ছেড়ে চলে গেল, সে সুখ হয়তো সে এখনও পায়নি? জুলি : তোমার মতো পুরুষের সাথে ১৮ বছর থেকেও যে নারী সুখী হতে পারে না, তার সুখের সংজ্ঞা আমার চিন্তাশক্তির বাইরে! আসলে আমার কি মনে হয় জান, মার্গারেট নিজেও জানে না ও কি চায়।

আমি বললাম, কিন্তু আমার বিশ্বাস, ও একটা মনের মতো সঙ্গী পেয়ে খুব সুখে আছে।

তুমি এখনো ওকে ভীষণ ভালোবাসো, তাই ওর এতো মঙ্গল চাও।

এ কথা সে কথায় সময় এগিয়ে চলে। আমি কয়েকবার ওকে স্মরণ করালাম, বিশেষ কি কথা সে আমাকে বলতে চায়, যার আভাস সে আমাকে গত রাতে দিয়েছিলো। কয়েকবার এড়িয়ে গিয়ে, একবার বললো, সে কথা হবে আগামীকাল রাতে। আমার এখনও কিছু সময় আছে। তারপর ঘুরে ফিরে সে শুধু আমাকে নিয়েই কথা বলতে থাকলো। আমি ভবিষ্যতে কি করবো, লেখালেখির যে পরিকল্পনা ছিলো, তার কতোদূর হলো। সত্যিই কি আমি আর দেশে একবারও যেতে পারবো না? আমার মেয়েরা দেশে কি করে, ওদের ভবিষ্যৎ কি ইত্যাদি। আমি কি মৃত্যু নাগাদ সত্যি একাই থাকবো?

সুদীর্ঘ আলাপের মত্ততায় কখন যে সূর্য ওঠার আগের প্রথম মৃদু আলোকরেখাটি বন্ধ জানালার সাটার ভেতর করে জুলির দু চোখে এসে পড়েছিলো, তা জানি না। হঠাৎ দেখলাম এবং শিউরে উঠলাম, দু চোখেই আসন্ন মৃত্যুর স্পষ্ট ছাপ! চোখের ঔজ্জ্বল্য আর আগের মতো নেই। আমার ব্যাকুলতা টের পেয়ে জুলি শীর্ণ মুখে হাসির রেখা টেনে বললো, ভয় নেই, আজকের দিনটাও আমার, তবে আজকের প্রভাতটাই শেষ প্রভাত। আবু, প্রিয় বন্ধু আমার, জানালাটা খুলে দাও। শেষবারের মতো আজ এ পৃথিবীর শেষ সূর্যোদয়টি প্রাণভরে দেখি। আমি জানালাটা খুলে দিলাম। মেঘমুক্ত আকাশ, পূর্বদিক লাল, সূর্যদেব তার সাত রঙের সাত ঘোড়ার রথে ধীরে ধীরে উদিত হচ্ছেন। কিছুক্ষণ এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য অবলোকন করে জুলি হঠাৎ বললো, ঐ দেশে গিয়ে আমি তোমার বাবা-মাকে খুঁজে বের করবো, তাদের বলবো, জার্মানে এসে তোমার জীবন দুঃখে, সুখে, ব্যথাবেদনায়, আনন্দে, কষ্টে কাটছে। তোমার সমস্ত কথাই ওদের আমি বিস্তারিত জানাব এবং তোমার জন্য ওদের সাথে অপেক্ষা করবো। যখন সময় হবে, তুমি আসবে আমাদের কাছে। তখন তোমার এ পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের চিরতরে অবসান ঘটবে।

একি বললো জুলি? আমি এসেছি ওকে ওর শেষ যাত্রায় সঙ্গ দিতে, ওর শেষ মুহূর্তগুলোতে হাতে হাত রেখে আর হৃদয়ের স্পর্শ দিয়ে, মৃত্যুকে মধুর আর সহনীয় করে তুলতে, আর ঐ কিনা উল্টে আমাকেই, আমার ব্যর্থ আর একাকিত্বের যন্ত্রণায় বিধ্বস্ত জীবনে যেভাবে প্রতিনিয়ত অবহেলা আর উপেক্ষার শিকার হয়ে পলে পলে দগ্ধ হচ্ছি, তার জন্য ওর জীবনের

শেষ মুহূর্তে আমাকে সান্ত্বনার প্রলেপ বুলিয়ে যাচ্ছে। সহসা প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করলাম, বিছানায় ঐ যে বিরাশি বছরের বৃদ্ধাটি শুয়ে আছেন, আজকেই হয়তো যার শেষ যাত্রা শুরু হবে, তার শেষ প্রস্থানের সাথে সাথেই আমার অতীতের শোক বৃক্ষটির শেষ পুষ্পটিও ঝরে পড়বে।

হজপিস কর্মীদের বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়, কোনো অবস্থাতেই সঙ্গ দেবার সময় রোগীর সামনে কাঁদতে নেই। ওতে মৃত্যুপথযাত্রী দুর্বল হয়ে পড়েন এবং তাতে করে, হজপিসের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে জুলির আমার প্রতি এতো উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ আর স্নেহের পরিচয় পেয়ে চোখের জল আর কোনো বাঁধ মানলো না। জুলি দেখলাম, বেশ শক্ত, ওর চোখ ম্লান। কিন্তু শুকনো। ও বললো, যাও আবু, ঘরে গিয়ে শুয়ে পর, তার আগে ভালো করে নাস্তা করো। আজ আর আমি বাইরে যাবো না, ঘরেই দুপুরের খাওয়াটা সেরে পরে আর কিছু খাব না। তুমি রাতের খাওয়ার পর, আমার পক্ষ থেকে সবার কাছ থেকে আমার বিদায় চেয়ে নিয়ে আমার ঘরে চলে এসো। বুঝলাম ওর আর বিছানা থেকে ওঠার শক্তি নেই, আমি কষ্ট পাবো, এজন্য আমাকে বলছে না। এবং আজ রাতই শেষ রাত।

> **দীর্ঘ একহারা শরীর, কাঁচা সোনার মতো গায়ের রঙ, টানা টানা সুন্দর চোখ। হঠাৎ আজব মনে হলো, এই অপূর্ব সুন্দরী মহিলা কেন যৌবনে কোনো পুরুষের নজরে পড়েনি? জুলির যৌবনকালের যুবকদের দুর্ভাগ্য ও বোকামির কথা ভেবে আজ নিজেরই দুঃখ হলো। কেন ঐ যুগে জুলির শহরে আমার জন্ম হলো না!**

রাতে খাবার পর সবাইকে যখন জুলির পক্ষ থেকে বিদায় জানালাম, দেখলাম কেউ তেমন আশ্চর্য হলো না। এ ধরনের তৃতীয় পক্ষ থেকে বিদায় নেওয়া এখানে নতুন কোনো ব্যাপার নয়। মৃত্যুর তিন-চার দিন আগে চলচ্ছক্তি শেষ হওয়াটাই স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে জুলি ব্যতিক্রম ছিলো, মৃত্যুর একদিন আগেও সে সবার সাথে বসে খেয়েছে। শুধু নার্স মেলানি বললো ও যাবে আমার সাথে জুলির কাছে বিদায় নেবার জন্য। ঘরে এসে দেখলাম, আজ আর জুলি বিছানায় আধ বসা হয়ে নেই, চিৎ হয়ে গলা অবধি কম্বল টেনে শুয়ে আছে। এমনিতেই শুকনো শরীর, মনেই হয় না বিছানায় কেউ শুয়ে আছে। মেলানি বিদায় নিতে গিয়ে প্রায় কেঁদে ফেললো। অল্প বয়সী, পেশাগত নার্স এখনও হয়ে উঠতে পারেনি। জুলি অনেক কষ্টে মাথাটা উঠিয়ে ওর শিরচুম্বন করলো। মুখে এখনো ঝলমলে হাসি। মেলানি আমায় শুভরাত্রি জানিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে প্রস্থান করলো। গোটা জীবনটাই ওর সামনে পড়ে আছে, এ ধরনের বিদায় কতো শতবার ওর নিতে হবে, কিছু বছর পরেই এতে আর মন খারাপ হবে না, শোক হবে গতানুগতিক রুটিন, সয়ে যাবে। এর মধ্যেই জুলি আবার শুয়ে পড়েছে। কিন্তু আজ বড় চুপচাপ, শূন্য দৃষ্টিতে ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে, আমাকেও চেয়ে দেখছে না। আমিও কিছু বলছি না। সাধারণত কর্মীর কথা শুরু করার নিয়ম নেই, রোগীই প্রথম আলাপের উদ্যোগ নেন। হঠাৎ জুলি সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে বললো, তোমার কি মনে হয় আমার কোনোদিনই কোনো পুরুষ বন্ধু ছিলো না? আমি পরিবেশটা হালকা করার জন্য বললাম, কেন আমি কি তোমার মেয়ে বন্ধু? না, না সে কথা বলছি না, আমার যৌবনের দিনের কথা বলছি, যখন আমার বয়স ২০/২২ মানে '৪৬/ '৪৭ সালের কথা, তখন তুমি মায়ের কোলে শুয়ে তার বুকের দুধ খাচ্ছ! দেখলাম আমার জন্ম যে ৪৫ সালে এটা তার মনে আছে। ও আচ্ছা, কিন্তু তুমি তো আমায় বলেছো, তুমি চির কুমারী। বিয়েশাদী করোনি। হ্যাঁ, আমি বিয়ে করিনি, কিন্তু আমি মাদার মেরি নই। অর্থাৎ সে ভার্জিন নয়। আমার মাথায় প্রায় বজ্রপাত, বলে কি জুলি?

সময় কম, খুবই সংক্ষেপে ও তার কথাটি আমায় জানাল, যা আমাকে বলার জন্য সে গত তিন দিন যাবৎ নিজের সাথে অবিরত লড়াই করে যাচ্ছে।

১৯৪২ সালে রুশফ্রন্টে যুদ্ধে গিয়ে তার পিতা চিরতরে নিখোঁজ হয়ে যান। একমাত্র সন্তান নিয়ে মা দুজনের আহার ও বাসস্থানের জন্য, ১৯৫০ সালে মৃত্যু অবধি, নানারকম কাজ করেন। যুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালে আমেরিকার আফ্রো-আমেরিকান সৈনিক ডেভিডের সাথে জুলির পরিচয় ও প্রেম। তখন ওর বয়স ২২। দুই বছর পরেই গর্ভবতী হলো এবং জন্ম দিলো এক কন্যাসন্তানের। ডেভিড ও মা উভয়ের চাপের মুখে তরুণী মাতার সন্তান পালনের আন্তরিক ইচ্ছা জলাঞ্জলি দিতে হলো। দত্তক আইন অনুসারে জুলির এক মাসের কন্যাশিশুটিকে অজ্ঞাতভাবে কোনো এক নিঃসন্তান দম্পতির কাছে এডাপসন কর্তৃপক্ষ হস্তান্তর করলেন। ১৯৫২ সালে তাকে না বলেই ডেভিড আমেরিকা চলে যায়। ডেভিডের সন্তানের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও তার নিঃশব্দ অন্তর্ধান তাকে আর কোনোদিন নতুন কোনো পুরুষের সাথে প্রেমে অনুপ্রাণিত করেনি। একাকী থেকে শিক্ষকতায় জীবন উৎসর্গ করে জুলি।

১৯৯৭ সালে আমাদের হজপিস কোর্সের সময়, জীবন মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটনের বিশদ আলাপ আলোচনার সময় তার প্রথম একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মে নিজের গর্ভের সন্তানটিকে একবার দেখবার। সে সময় কোর্সের ফাঁকে ফাঁকে আমি যে দেশে রেখে আসা আমার দুই মেয়ের এবং তাদের সাথে দীর্ঘ ২০ বছর না দেখা হওয়ার ব্যথার কথা বলতাম, তাতেও নাকি তার নিজের মেয়েকে একবার দেখার বাসনাটা বেড়ে যেত। ১৯৯৮ সালে বহু অফিস-আদালত ঘুরে, পুরনো ফাইলপত্র ঘেঁটে জানা গেলো যে, দত্তক বাবা-মার সাথে ১৯৫৫ সালে ৭ বছর বয়সে মনিকা (তার মেয়ের নতুন নাম) নিউইয়র্ক চলে গেছে। অনেক খোঁজখুঁজি করে আমেরিকার ঠিকানা যোগাড় করে জলি মেয়ের সাথে দেখা করার উদগ্র বাসনা বুকে নিয়ে ১৯৯৯ সালে মেয়ের নিউইয়র্কের বাড়ির দরজায় নক করলেন। মেয়ে দরজা খুলে পরিচয় পেয়েই সশব্দে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভেতর থেকে বললো, তার বাবা-মা দুজনেই মারা গেছেন। সে আমেরিকান, জার্মানের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। জুলি এ ধরনের নিষ্ঠুর ও অমানবিক প্রত্যাখ্যান আশা করেনি! অনেক অনুনয়-বিনয় করেও আর এক মুহূর্তের জন্যও দরজা খুলেনি মনিকা। এক পর্যায়ে সে পুলিশ ডাকার হুমকি দেয়। আত্মসম্মান সচেতন জুলি অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে, ব্যথায় জর্জরিত হয়ে জার্মানে ফিরে আসে। এরপর ৪/৫ বার টেলিফোনে কথা বলার চেষ্টা করেছে, মনিকা কথা বলেনি। এর ওর কাছে শুনেছে, মেয়েটিও তার মতো শিক্ষক, বাচ্চাদের স্কুলে। মা এক মাস বয়সে তাকে ত্যাগ করেছে, এ অবহেলা সে আজও ভুলে-নি, হয়তো কোনোদিন ভুলবেও না। নিশ্চয়ই দত্তক বাবা-মা মরার আগে তাকে সব কথা বলে গেছেন।

প্রিয় বন্ধু আবু, এ কথা আজ পর্যন্ত কোনো বন্ধু, সহকর্মী বা আত্মীয়স্বজনকে বলিনি। কীভাবে বলবো, এ তো ঘোর লজ্জার কথা, মাতৃ জীবনের এক নিষ্ঠুর বিড়ম্বনা। তোমার সাথে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবার পরই ভেবেছিলাম, মৃত্যুর আগে তোমাকেই শুধু বলে যাব। আজ আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হলো। তুমি তো তোমার ভাগ্নে, আর বোনের সাথে দেখা করার জন্য নিউইয়র্ক যাও, এরপর যখন যাবে, মাত্র একবার মনিকার সাথে দেখা করে আমার হয়ে ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিও। ও যেন ওর প্রতি আমার কৃত অপরাধের জন্য আমাকে ক্ষমা করে। ওকে '৪৮ সালে তৎকালীন যুদ্ধপরবর্তী বিধ্বস্ত জার্মানের একজন দরিদ্র কুমারী মাতার অসহায়তার কথা বুঝিয়ে বলো। তুমি পারবে ওকে বোঝাতে। তোমার মতো জার্মানের ইতিহাস জানা লোক আমি আমার পরিচিত মহলে আজ নাগাদ খুঁজে পাইনি।

মনিকার কথা শুনে আমি এতোটাই অভিভূত হয়ে গেছি যে, ওর এতো বড় প্রশংসা আমার কানেই গেলো না।

আবু, আমার বন্ধু জেনে যদি ও তোমাকেও অপমান করে, আমার কথা ভেবে ওকে ক্ষমা করে দিও। এতোক্ষণ সে সামলে ছিলো, এ কথাটি বলে সদাহাস্যময়ী এই শক্ত মনের মহান মানুষটি ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। এ পর্যন্ত আমি ওকে এভাবে শব্দ করে কাঁদতে কখনো দেখিনি।

বালিশের তলায় হাত দিয়ে একটা খাম বের করে আমার হাতে দিলে বললো, এর মধ্যে

মনিকার ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার আছে। আমাকে কথা দাও, তুমি এরপর আমেরিকা গেলে আমার হয়ে মনিকার সাথে নিউইয়র্কে অবশ্যই দেখা করবে।

তোমার এতোবার বলার দরকার নেই, অবশ্যই যাবো। যে ভাবেই হোক ওর সাথে দেখা করে সব কথা ওকে জানাবো। এখন তুমি শান্ত হও। বলে ওকে বিছানায় ভালো করে শুইয়ে দিলাম, কম্বলটা দিয়ে সারা গা ঢেকে দিলাম। চোখ দুটি যত্ন করে মুছে দিলাম। দেখলাম তার সারা গা উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে। দু হাতে ওর দুই হাত ধরে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে এই প্রথম আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। মৃত্যুর একদম শেষ মুহূর্তে এই ভয়টার একটাই অর্থ :

ওর শেষযাত্রা শুরু হয়ে গেছে। হঠাৎ ও আমার হাত দুটি ভীষণ শক্ত করে ধরলো, একটু ব্যথ্যাও পেলাম যেন। এই সময়ে ওর চোখ দুটি সম্পূর্ণ খুলে গেলো, ঠিক আগের মতো জ্বল জ্বল করছে। মনে হলো মৃত্যুলোকে প্রস্থানের আগে ও জীবনের শেষ শক্তি একত্র করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে। এবার সরাসরি ও আমার দিকে তাকাল এবং বললো, আমার আরেকটি শেষ কথা, প্রিয় আবু, তুমি একজন প্রাণবন্ত মাথা থেকে পা অবধি সঙ্গপ্রিয় মানুষ, সম্পূর্ণ একা থাকা, তোমার জন্য মার্গারেটের সাথে বিচ্ছেদের চাইতে কম যন্ত্রণাদায়ক নয়, এটা আমি ভালো করেই জানি। সম্ভব হলে নতুন বন্ধু খুঁজে নিও। কোনো সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ সারা জীবন একা থাকতে পারে না। একটু থেমে লম্বা একটা দম নিয়ে স্নেহ-ভরা ও আদুরে গলায় বললো, আমার পরম প্রিয় বন্ধু আবু, তোমার অতীতের, বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের সমস্ত দুঃখ, কষ্ট, ব্যথা, বেদনা আমি আমার সাথে নিয়ে যাচ্ছি, আর আমার অতীত বর্তমানের সমস্ত আনন্দ ও সুখশান্তি তোমাকে এই পৃথিবীতে আমার শেষ উপহার হিসেবে দিয়ে যাচ্ছি। মনে হলো ওর চোখের জ্যোতি এক ফুয়ে নিভে গেলো, কি যেন একটা অদৃশ্য অস্তিত্ব, একটা নতুন জীবনের দোরগোড়ায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসীম অতলে প্রবেশ করলো এবং নিঃশব্দ-শব্দে শশব্যস্তে হারিয়ে গেলো। আমি যতোদিন শেষ যাত্রায় মৃত্যুকে নিকট থেকে দেখেছি, এই একই ধরনের অনুভূতি হয়েছে। কিছু একটা অদৃশ্য আবার বর্ণনার অতীত দৃশ্য মৃতের দেহ থেকে বেরিয়ে মহালোকে অন্তর্ধান করে, এটা আমার কাছে সূর্যোদয়, সূর্যাস্তের মতোই সত্য!

আমার হাত দুটি আর কিছুতেই ছাড়াতে পারছি না। যেন ও আমাকেও সাথে নিয়ে যেতে চায়। খুব ভালো করেই জানি, বিছানায় দুটি নিষ্প্রভ চোখ নিয়ে যে শুয়ে আছে, ও আর জুলি নয়, ওর শূন্য দেহ, একটা খোলস। জুলি এখন রওনা হবে অন্য লোকে, যেখানে সুখ-দুঃখের হিসাব, আমাদের এ পৃথিবীর চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা। ওখানে নিজের জন্মভূমি থেকে প্রাণভয়ে পালিয়ে এসে বিজন প্রবাসে ৩০ বছর অনিশ্চিত অবস্থায় থাকতে হয় না। দীর্ঘদিনের সঙ্গিনীর সাথে মৃত্যুসম যন্ত্রণার মতো বিচ্ছেদ হয় না। ওখানে কোনো জুলি এক মাসের সন্তানকে অবস্থার চাপে দত্তক দিয়ে সারা জীবন হাহাকার করে না।

আমি বললাম, প্রিয় বন্ধু জুলি, তুমি না আমাকে কথা দিয়েছ আমার বাবা-মার সাথে দেখা করে আমার সব কথা বলবে, ওদেরকে সাথে নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। আমার হাত দুটিও জোর করে ধরেই রইল। এবার বললাম, মনিকার সাথে দেখা করে তোমার কথা বলার জন্য তো আমাকে একবার আমেরিকা যেতে হবে। তুমি যদি হাত না ছাড়, তোমাকে দেয়া কথা কীভাবে রাখবো? এবার ঝট করে ওর হাত দুটি খুলে বিছানায় পড়ে গেল। মনে হলো ওর সুন্দর দুটি বোজা ঠোঁটে একটা স্মিত হাসির রেশ খেলে গেল! নিয়মানুযায়ী, ওকে পুরোপুরি চিৎ করে শুইয়ে চোখ দুটি চিরতরে বুজিয়ে দিলাম। নতুন কম্বল এনে পরিপাটি করে সারা গা চিবুক অবধি ঢেকে দিলাম। একটা রুমাল দিয়ে মাথা থেকে গলা অবধি একটা গেঁড়ো দিয়ে বেঁধে দিলাম, যাতে মুখ হা হয়ে না যায়, হা করা মুখ তো আর সে বন্ধ করতে পারবে না! বিদ্যুতের আলো নিভিয়ে দিয়ে বিছানার দু পাশে দুই সাইড টেবিলে মোমবাতি জ্বেলে দিলাম। কিচেন থেকে এ উদ্দেশ্যেই রাখা দুটি ফুলের তোড়া এনে ফুলদানিতে ঢুকিয়ে ওর মাথার দিকে উঁচু টেবিলে রাখলাম।

আগরবাতি জ্বেলে দিলাম (এটা সার্ববৈশ্বিক)। তারপর ডিউটি নার্সকে খবর দিয়ে মিস বারবারাকে নিয়মমাফিক টেলিফোন করতে অফিসে যাবার জন্য দরজার দিকে ঘুরতেই স্পষ্ট শুনলাম সেই কলকলানো হাসি এবং জুলির গলা : প্রিয় বন্ধু, সবই ঠিক করছে, কিন্তু আমার হাত দুটো তো ক্রস করে রাখলে না! সত্যিই তো ওর হাত দুটো কম্বলের নিচে দেহের দু পাশে লম্বা করে রেখেছি, নিয়ম হলো, বুকের উপর তাড়াআড়ি করে ক্রস করে রাখা। বললাম, দুষ্টু মেয়ে এখনও ঐ লোকে রওনা দাওনি দেখছি, তোমার আমার বাবা-মা'রা তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে, এবার যাও লক্ষ্মীটি। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস কানে এলো। একটা ছায়ার মতো অবয়ব এগিয়ে এলো আমার দিকে, আমাকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলো, আমার দুই গালে ঠোঁটের পরশ, কপালে একটা আলতো চুমুর স্পর্শ পেলাম। অস্ফুট একটা স্বর ভেসে এলো, আউফ ভিদারজেহেন, লিবার ফ্রয়েন্ড আবু। আমিও নিঃশব্দে বললাম, অবশ্যই আবার দেখা হবে, প্রিয় বন্ধু জুলি। এ ধরনের অলৌকিক আলিঙ্গন ও অশরীবীর বিদায় সম্ভাষণের অভিজ্ঞতা আমার আগেও হয়েছে, এসবে আর আজকাল বিস্মিত হই না।

কি যেন একটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো, জানালা দিয়ে, না দরজা দিয়ে, না দেয়াল ভেদ করে, তা বলতে পারবো না। এবার বুঝলাম আমি সম্পূর্ণ একাকী।

ও শেষ যাত্রায় রওনা হয়ে গেছে। কম্বল তুলে ওর হাত দুটো ক্রস করে দিলাম। ওর কপালে একটা চুমু দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। এ ঘরে আমি আর আসবো না।

ওর আত্মার ও নিষ্প্রাণ দেহের সাথে আমার বিদায় নেয়া হয়ে গেছে। রাত ৪টা বাজে। এরপর সব রুটিন। টেলিফোন পেয়ে অল্পক্ষণ পরেই মিস বারবারা এসে গেলেন। আমাকে ধন্যবাদ জানালেন, জুলিকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সঙ্গ দেবার জন্য। জুলি কোনো ধর্ম মানতো না। ও টেস্টামেন্ট করে গিয়েছিলো, ওর দেহ পোড়ানো হবে। কোনো অনুষ্ঠান হবে না। মৃতদেহ পোড়ানোর জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আছে, জুলি তাদের সাথে যথাসময়ের লিখিত চুক্তি করে টাকাপয়সা সব দিয়ে গিয়েছিলো। চুক্তি মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের লোক এসে ওর মৃতদেহ নিয়ে যাবে, ওদের নিজস্ব চুল্লিতে দেহ পুড়িয়ে ছাই অজ্ঞাত স্থানে পুঁতে দেবে। অর্থাৎ মৃত্যুর পর জুলি তার নশ্বর দেহের কোনো চিহ্ন রাখতে চায়নি। তার দরকারটাই বা কি? ওর তো এ বিশ্ব সংসারে কেউ নেই। একটি মাত্র গর্ভজাত সন্তান তো তাকে ন্যূনতম স্বীকৃতিও দিলো না। স্থাবর কোনো সম্পত্তি তার ছিলো না, অস্থাবর কিছু ব্যাংকের সঞ্চয়, সে ইউনেস্কোকে দান করে গেছে। বার্লিন থেকে আসার সময় তার যাবতীয় বই পুস্তক, গানের রেকর্ড, সিডি ইত্যাদি ওখানকার এক যুব ক্লাবকে দান করে এসেছিলো। এ পৃথিবীর যাবতীয় ঋণ আর পাওনা সে শোধ করে গেছে। সব কর্তব্য শেষ করে গেছে। শুধু একটা দুঃখ নিয়ে সে শেষ যাত্রায় যাবার সময় একটু থমকে দাঁড়িয়েছিলো। মনিকার, নিজের একমাত্র সন্তানের ক্ষমা সে পায়নি। সে দায়িত্ব আমাকে সে দিয়ে গেছে। তার জন্মদাত্রী মায়ের সত্য পরিচয় তাকে দেবার জন্য, আমি আমৃত্যু চেষ্টা করবো মনিকার সাথে অন্তত একবার দেখা করাবো। এটা আমার ঋণ জুলির কাছে!

নিষ্ঠুর প্রবাস জীবনে একে একে মৃত্যু সংবাদ এসেছে : পরমপ্রিয় মাতৃসমা ভ্রাতৃজায়া, পিতৃসম ভগ্নিপতি, জন্মদাত্রী মাতা, আমার পরম প্রিয় বড় বোন, কতো নিকটাত্মীয়, বন্ধু স্বজন! এদের মৃত্যুশয্যায় তাদের সাথে আমার শেষ দেখা হয়নি। '৭২ সালে যখন রোগাক্রান্ত পিতার অকাল মৃত্যু হলো, স্বাধীনতা-পরবর্তী যানবাহন সংকটের দরুন, চাকরিস্থল থেকে যথাসময়ে আসতে না পারার জন্য, তাঁর সাথেও শেষ দেখা হয়নি। আজও এদের সবার সাথে স্বপ্নে আমার জীবিত সাক্ষাৎকার হয়! আমার স্মৃতিতে এরা আজও আমার কাছে অমর। বিজন প্রবাসে গত প্রায় দশ বছর ধরে মৃত্যু পথযাত্রীদের সময় ও সুযোগ পেলে সঙ্গ দেই, অভূতপূর্ব আনন্দ ও অভিজ্ঞতার আস্বাদে আপ্লুত হই। এদের সঙ্গ দেবার সময় জন্মভূমিতে অতীতে মৃত্যুশয্যায় শায়িত স্বজনদের স্মরণ করি। মৃত্যুর প্রতি আমার ভয় বহু আগেই অন্তর্হিত হয়েছে। আমি সাগ্রহে তার অপেক্ষা করছি। যতো শিগগির উনি আসেন, ততই আমি খুশি! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মৃত্যলোকে আমার সব স্বজনদের সাথে, যাদের আমি এ পৃথিবীতে বিদায় জানাতে পারিনি, আবার দেখা হবে।

প্রবাসে আমার বর্তমান বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা গুনতে হাতের দুটো আঙুলও লাগে না। একজন অত্যন্ত আপনজন জুলি আজ হারিয়ে গেলো চিরতরে আমার জীবন থেকে।

তিরিশ বছর আগে আমার প্রিয় জন্মভূমি হারিয়ে গেছে, সাথে গেছে সংসার, সন্তান, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সব! আমি হারিয়ে যাব কবে?

alharun@gmx.de